International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)
E-ISSN: 2582-2160 • Website: www.ijfmr.com • Email: editor@ijfmr.com

বঙ্কিমচন্দ্রের ‘বন্দে মাতরম্’: অনুপ্রেরণা ও অভিপ্রায়

ড. তপোব্রত ভাদুড়ি

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, পুরাশ কানপুর হরিদাস নন্দী মহাবিদ্যালয়

সারাংশ –
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘বন্দে মাতরম্’ সঙ্গীত দেশমাতৃকার বন্দনা রূপেই লোকপ্রসিদ্ধ। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্নিযুগে বহু নির্ভীক বিপ্লবী গানটিকে দেশপ্রেমের অমোঘ মন্ত্র হিসেবে সানন্দে গ্রহণ করেছিলেন। তবে এই রচনার অন্তর্নিহিত উপাদানগুলি বিচার করলে দেখতে পাওয়া যায়, মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত দেবীমাহাত্ম্য-র ভাব ও ভাষারূপের সঙ্গে গানটির ঘনিষ্ঠ সাযুজ্য আছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে ‘আনন্দমঠ’ উপন্যাসে গানটি প্রথম প্রকাশিত হওয়ার পরে ‘বন্দে মাতরম্’ সঙ্গীতের অন্তর্লীন কিছু অনুষঙ্গ মুসলমান সমাজের কাছে বিতর্কের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল মূলত দুটি বিশেষ কারণে। প্রথমত, এই গানে দেশমাতৃকাকে হিন্দু পৌরাণিক দেবমণ্ডলের বিভিন্ন দেবতার প্রতিচ্ছবি হিসেবে আরাধনা করা হয়েছে, যা ইসলামের অপৌত্তলিক একেশ্বরবাদী আদর্শ বা ‘তৌহিদ’-এর পরিপন্থী। দ্বিতীয়ত, ‘আনন্দমঠ’ উপন্যাসের কাহিনী যে ঐতিহাসিক পটভূমিতে রচিত, সেখানে মুসলিম সমাজের প্রতি এক ধরণের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়েছে; যা স্বাভাবিক ভাবেই মুসলমান সমাজের একটি বড় অংশকে রাজনৈতিক ভাবে ব্যথিত ও বিমুখ করে তোলে। বর্তমান প্রবন্ধে এই বিষয়গুলি নিয়ে তথ্যনিষ্ঠ বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

সূচক শব্দ – বন্দে মাতরম্, আনন্দমঠ, বঙ্কিমচন্দ্র, সন্ন্যাসীবিদ্রোহ, দেবীমাহাত্ম্য, শ্রীশ্রীচণ্ডী, আদিমাতা

ভূমিকা –
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কালজয়ী সৃষ্টি ‘বন্দে মাতরম্’ ভারতের জাতীয় স্তোত্র। ১৮৭০-এর দশকে রচিত এই বন্দনাগীতিটি ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর ইতিহাস-আশ্রিত উপন্যাস ‘আনন্দমঠ’-এ স্থান পায়। ‘বন্দে মাতরম্’ কথাটির আক্ষরিক অর্থ হল – ‘মাতা (দেশমাতৃকা)-কে বন্দনা করি’। পরাধীন ভারতের মুক্তি সংগ্রামে এই গানটি ছিল বিপ্লবীদের প্রধান মন্ত্র এবং আত্মত্যাগের অবিনাশী প্রেরণা। ১৮৯৬ সালে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম এই গানটিতে সুরারোপ করে গেয়েছিলেন। ১৯৫০ সালের ২৪ জানুয়ারি ভারতের গণপরিষদ এই মহিমান্বিত গানের প্রথম দুটি স্তবককে আনুষ্ঠানিক ভাবে জাতীয় স্তোত্রের মর্যাদা দেয়, যা আমাদের জাতীয় সংগীত ‘জনগণমন’-র সমতুল্য।

পর্যালোচনা -
বন্দে মাতরম্।
সুজলাং সুফলাং
মলয়জশীতলাং

শস্যশ্যামলাং

মাতরম্‌।

শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীম্‌

ফুল্লকুসমিত-দ্রুমদলশোভিনীম্‌

সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীম্‌

সুখদাং বরদাং মাতরম্‌।

সপ্তকোটিকণ্ঠকলকলনিনাদকরালে,

দ্বিসপ্তকোটিভুজৈর্ধৃতখর-করবালে,

অবলা কেন মা এত বলে৷

বহুবলধারিণীং

নমামি তারিণীং

রিপুদলবারিণীং

মাতরম্‌।

তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম

তুমি হৃদি তুমি মর্ম

ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।

বাহুতে তুমি মা শক্তি

হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি

তোমারই প্রতিমা গড়ি

মন্দিরে মন্দিরে।

ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী

কমলা-কমল-দলবিহারিণী

বাণী বিদ্যাদায়িনী

নমামি ত্বাং

নমামি কমলাম্‌

অমলাম্‌ অতুলাং

সুজলাং সুফলাং

মাতরম্‌

বন্দে মাতরম্‌

শ্যামলাং সরলাম্‌

সুস্মিতাং ভূষিতাম্‌

ধরণীং ভরণীম্‌

মাতরম্‌। [১]

বঙ্কিমচন্দ্রের ‘বন্দে মাতরম্’ গীত প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দের মার্চ-এপ্রিল মাসে। ‘বঙ্গদর্শন’ পত্রিকার চৈত্র ১২৮৭ সংখ্যায় মুদ্রিত ‘আনন্দমঠ’ উপন্যাসের প্রথম খণ্ডের দশম পরিচ্ছেদে। বঙ্কিমচন্দ্রের অনুজ পূর্ণচন্দ্রের বিবৃতি থেকে জানা যায়, গানটি ‘আনন্দমঠ’ রচনার অনেকদিন আগেই লেখা হয়ে পড়ে ছিল। ‘বঙ্গদর্শন’ পত্রিকার কার্যাধ্যক্ষ পণ্ডিত রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় পত্রিকা-সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্রের টেবিলে ‘বন্দে মাতরম্’ -এর পাণ্ডুলিপিটি দেখতে পান। পত্রিকার পৃষ্ঠাপূরণের জন্য রামচন্দ্র গানটি প্রকাশিতব্য সংখ্যায় ছাপতে চেয়েছিলেন। [২] সেসময়ে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁকে নিষেধ করেন। কিন্তু ঠিক কবে কখন এই ঘটনাটি ঘটেছিল, পূর্ণচন্দ্র কোথাও নির্দিষ্ট ভাবে তা জানাননি।

সকলেই জানেন, ১২৭৯ বঙ্গাব্দের ১ বৈশাখ (১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের ১২ এপ্রিল) তারিখে মাসিক ‘বঙ্গদর্শন’ পত্রিকার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। সুতরাং গানটি নিঃসন্দেহে ১৮৭২-এর মার্চ-এপ্রিলের পরে লেখা। জগদীশ ভট্টাচার্য তাঁর ‘বন্দে মাতরম্’ গ্রন্থে দেখিয়েছিলেন, ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে ভারতের প্রথম জনগণনা থেকে প্রাপ্ত পরিসংখ্যানের ওপরে নির্ভর করে ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দের মার্চ-এপ্রিলে ১২৭৯ বঙ্গাব্দের চৈত্রের ‘বঙ্গদর্শন’ পত্রিকায় প্রকাশিত সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা ‘বঙ্গদেশের লোকসংখ্যা’ প্রবন্ধে আছে: ‘বঙ্গদেশের লেপ্টেনান্ট গবর্ণরের শাসনাধীনে যে-প্রদেশ, তাহাতে ৬৬,৮৫,৬৮৫৬ জন লোক বসতি করে। প্রায় সাত কোটি।’ এর কিছুকাল পরে, ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে তদানীন্তন বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি থেকে সিলেট-কাছাড়-গোয়ালপাড়া – এই তিনটি প্রদেশ আসামের সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় তদানীন্তন বঙ্গদেশের জনসংখ্যা কমে যায়। এই ঘটনার সূত্র ধরে ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর-নভেম্বরে ১২৮১ বঙ্গাব্দের কার্তিকের ‘বঙ্গদর্শন’ পত্রিকায় প্রকাশিত ‘আমার দুর্গোৎসব’ রচনায় কমলাকান্তের বাচনিকে ‘বঙ্গমাতা’-র উদ্দেশে বঙ্কিমচন্দ্র লেখেন: ‘এস মা গৃহে এস –, যাঁহার ছয় কোটি সন্তান – তাঁহার ভাবনা কি?’ ‘বন্দে মাতরম্’ গানের দশ-এগার সংখ্যক পঙক্তিতে আছে ‘সপ্তকোটিকণ্ঠকলকলনিনাদকরালে’ ও ‘দ্বিসপ্তকোটিভুজৈর্ধৃতখর-করবালে’। সুতরাং এটা নিশ্চিত যে, ‘বন্দে মাতরম্’ কোনোভাবেই ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারির পরে লেখা হতে পারে না। [৩] এক্ষেত্রে পারিপার্শ্বিক তথ্যপ্রমাণের নিরিখে অনুমান করা যেতে পারে, ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের মার্চ-এপ্রিল থেকে ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারির মধ্যে কোনো এক সময়ে ‘বন্দে মাতরম্’ গীতির প্রাথমিক রূপটি রচিত হয়েছিল।

‘প্রাথমিক রূপ’ বলার কারণ হল, ১৮৭২-৭৪ থেকে ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ সময়কালের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র এই গানের মূল পাণ্ডুলিপির কোনো পরিমার্জনা বা সম্পাদনা বা সংযোজনা করেছিলেন কিনা, এ বিষয়ে কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায় না। ‘আনন্দমঠ’ উপন্যাসে গানটির যে পাঠ পাই, রামচন্দ্র অবিকল সেই চেহারাটিই সাত-আট বছর পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্রের টেবিলে দেখেছিলেন কিনা, সে-সম্পর্কে পূর্ণচন্দ্র সম্পূর্ণ নীরব।

অবশ্য ‘বন্দে মাতরম্’ কবে কোন্ চেহারায় লেখা হয়েছিল, বর্তমান আলোচনায় তা আমাদের প্রধান বিচার্য বিষয় নয়। উপরের আলোচনা থেকে শুধু একটিমাত্র তথ্য আমাদের কাছে বিবেচ্য। বঙ্কিমচন্দ্র স্বতন্ত্র সঙ্গীত রূপে ‘বন্দে মাতরম্’ কখনোই ছাপতে দিতে চাননি। উপন্যাসের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আগে বহু বছর লেখাটি ফেলে রেখেছিলেন। সুতরাং গীতিকারের অভিপ্রায় অনুসারে, ‘বন্দে মাতরম্’ নির্বিকল্প ভাবে ‘আনন্দমঠ’ উপন্যাসের অঙ্গীভূত রূপে ঔপন্যাসিকের আখ্যান-পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতেই গ্রহণযোগ্য ও আলোচ্য।

সাধারণ জনমানসে ‘বন্দে মাতরম্’ স্বদেশগীতি রূপেই প্রসিদ্ধ। ‘আনন্দমঠ’ উপন্যাসে গানটি মল্লার (মেঘমল্লার) রাগে নিবদ্ধ হলেও ১৮৯৬ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে সর্বপ্রথম গানের প্রথম নটি পঙক্তি দেশ রাগে পরিবেশন করেছিলেন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বঙ্গভঙ্গ-পরবর্তী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মুক্তি-আন্দোলনের সময় থেকে এই গানের সঙ্গে বিজড়িত চিত্তপ্লাবী আবেগের সূত্রে 'বন্দে মাতরম্' গীত ও 'বন্দে মাতরম্' নির্ঘোষ গভীর ও সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক তাৎপর্য লাভ করে। ১৯০৯ সালে শ্রীঅরবিন্দ 'Mother, I bow to thee!' শিরোনামে 'বন্দে মাতরম্' গানটির ইংরেজি অনুবাদ করেন। ১৯৩৭ সালে জাতীয় কংগ্রেস গানটির প্রথম নটি পঙক্তি স্বদেশবন্দনা রূপে গ্রহণ করে। ১৯৫০ সালের ২৪ জানুয়ারি ভারতীয় গণপরিষদে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে'-র প্রথম স্তবকটি ভারতের জাতীয় সঙ্গীতের মর্যাদা লাভ করলে 'বন্দে মাতরম্' গানের প্রথম নটি পঙক্তিকে ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রগীতের মর্যাদা দেওয়া হয়। সম্প্রতি ভারত সরকারের নির্দেশে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা সম্পূর্ণ গানটিই ঈষৎ বদলে (কোটিকোটিকণ্ঠকলকলনিনাদকরালে কোটিকোটিভুজৈর্ধৃতখর-করবালে) বাধ্যতামূলক ভাবে গেয় জাতীয় সঙ্গীত রূপে গৃহীত হয়েছে।

সরকারি এই সিদ্ধান্ত নিয়ে তর্ক-বিতর্কের অন্ত নেই। বিশেষ করে এই গানের মধ্যে দশপ্রহরণধারিণী দুর্গা, কমলদলবিহারিণী কমলা আর বিদ্যাদায়িনী বাণীর মতো হিন্দু পুরাণপ্রতিমার উল্লেখ এবং 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের সঙ্গে এই গানের ওতপ্রোত যোগ পৌত্তলিকতা-বিরোধী একেশ্বরবাদী অহিন্দু সম্প্রদায়ের মনে গভীর ক্ষোভ ও অসন্তোষ জাগিয়ে তুলেছে। ১৯৩৭ সালে গানের ওই বিশেষ দুটি দিক সম্পর্কে আপত্তি জানিয়েই রবীন্দ্রনাথ 'বন্দে মাতরম্'-এর শুধু প্রারম্ভিক নটি পঙক্তি জাতীয় গীতি রূপে গ্রহণ করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন, যা কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি সর্বান্তঃকরণে অনুমোদন করে।

এই প্রসঙ্গে, বর্তমান আলোচনায় আমরা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলতে চাই, বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম্' অখণ্ড একটি রচনা। সমগ্র গানটিতে নিগূঢ় একটি ঐক্য নিবিড় ভাবে অনুস্যূত হয়ে রয়েছে। সুতরাং গানটিকে খামখেয়ালি ভাবে ছেঁটে ফেলার পরামর্শ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠিক করেননি। সেইসঙ্গে আমরা এটাও দেখাতে চাই, 'বন্দে মাতরম্' আদৌ মূলত দেশমাতৃকার বন্দনা নয়। প্রকৃতপক্ষে এই গীত জগন্মাতা আদ্যাশক্তির স্তুতি। আমাদের আরেকটি অনুসন্ধানের বিষয় হল, এই রচনার অনুপ্রেরণার উৎস-বিচার। অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্র কোথা থেকে এ গানের রসদ সংগ্রহ করেছিলেন, সে-সম্পর্কে আলোকপাত করাও আমাদের উদ্দেশ্য।

বঙ্কিমের এই গানের দুই থেকে পাঁচ সংখ্যক পঙক্তিতে দেবীকে বলা হয়েছে — 'সুজলাং সুফলাং/ মলয়জশীতলাং/ শস্যশ্যামলাং/ মাতরম্'। অনন্তর সপ্তম পঙক্তিতে বলা হয়েছে — 'ফুল্লকুসুমিত-দ্রুমদলশোভিনীম্'। 'সুফলাং', 'শস্যশ্যামলাং', এবং 'ফুল্লকুসুমিত-দ্রুমদলশোভিনীম্' – মাতৃশক্তির পৌনঃপুনিক এই রূপকল্পনায় নিঃসন্দেহে তাঁর উদ্ভিজ্জপ্রাণ স্বভাবের বর্ণনা পাই। বৈদিক সাহিত্যে ও তৎপরবর্তী পৌরাণিক শাস্ত্রগ্রন্থে আদ্যাশক্তিকে 'অরণ্যানী' 'শাকম্ভরী' প্রভৃতি নানা নামে ও রূপে অর্চনা করা হয়েছে। এ সবই আদিম উর্বরতাবাদ (Fertility Cult)-প্রসূত আদিমাতা ধরিত্রীদেবীর রূপকল্পনা। অনেকেই জানেন, দুর্গোৎসবের সময়ে নবপত্রিকার আরাধনার মধ্যে এই শাকম্ভরী রূপেরই পূজা করা হয়। সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বলতে যে এখানে বিশেষ ভাবে বাংলাদেশের কথা বোঝানো হয়নি, তার একটা বড় প্রমাণ 'মলয়জশীতলাং' শব্দের ব্যবহার। 'মলয়জশীতলাং' শব্দের অর্থ মলয় পর্বত বা পশ্চিমঘাট পর্বতমালা থেকে প্রবাহিত শীতলবায়ু। আবার 'মলয়' শব্দটি সংস্কৃত ভাষার শব্দভাণ্ডারে এসেছে তামিল 'মালাই' শব্দ থেকে, যার অর্থ 'পর্বত' (তুলনীয়: আনামালাই)। সুতরাং দেখাই যাচ্ছে, মায়ের এই রূপ বঙ্গদেশের ক্ষুদ্র গন্ডির মধ্যে একান্ত ভাবে সীমাবদ্ধ নয়।

তাহলে এই দেবী আসলে কে? গানে তার উত্তর দিতে গিয়ে দেবীর সম্পর্কে বঙ্কিম দুটি শব্দ ব্যবহার করেছেন – 'শ্যামলাং' এবং 'ধরণীং'। 'শ্যামলা' মানে পৃথিবী। ভাগবত পুরাণে আছে 'শ্যামলাং ভূমিম্'। 'ধরণী' মানেও ধরিত্রী। 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতে উপর্যুপরি এই দুটি শব্দের প্রয়োগের মধ্য দিয়ে নিশ্চিত ভাবেই ধরিত্রী দেবীকে দ্যোতিত করা হয়েছে। দেবীমাহাত্ম্যে ব্রহ্মার স্তবে এঁকেই বলা হয়েছে- 'জগতোঽস্য জগন্ময়ে' (১।৭৭)। [4] রাজা সুরথের প্রতি মেধা ঋষির উক্তিতে দেবীকে বলা হয়েছে 'জগৎ-মূর্তি'

(১।৬৪) [৫] ও 'জগদ্ধাত্রী' (১।৭০) [৬]। শ্রীশ্রীচণ্ডীর অর্গলাস্তোত্রেও দেবীকে বলা হয়েছে 'ধাত্রী' (১) — অর্থাৎ যিনি নিখিলবিশ্বকে ধারণ করেন। [৭] বঙ্কিমের গানে একইসঙ্গে এই দেবী 'ভরণীম্' ও বটে। 'ভরণী' মানে পালনকর্ত্রী। শ্রীশ্রীচণ্ডীতেও দেবীকে বলা হয়েছে – 'ত্বয়ৈতৎ পাল্যতে দেবি' (১।৭৬) [৮], এবং 'স্থিতিরূপা চ পালনে' (১।৭৬) [৯]। লক্ষ করবেন, 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে এই গানের উদ্দীপন বিভাবও ধরিত্রী। গীত আরম্ভের পূর্বমুহূর্তে 'যেন জ্যোৎস্নাময়ী, শান্তি-শালিনী, পৃথিবীর প্রান্তর-কানন-নগ-নদীময় শোভা দেখিয়া' ভবানন্দের 'চিত্তের বিশেষ স্ফূর্তি' হয়েছে। [১০] উপন্যাসে নিদাঘদগ্ধ মন্বন্তর-ক্লিষ্ট বুভুক্ষা-কাতর বাংলাদেশের পটভূমিতে ভবানন্দের গাওয়া শস্যপূর্ণা বসুন্ধরার এই বন্দনা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এ যেন ব্যথাতুর ভক্তহৃদয় থেকে উৎসারিত স্বস্তিবাচক শান্তিমন্ত্র।

শ্রীশ্রীচণ্ডীর সঙ্গে বঙ্কিমের গানের আরেকটি যোগাযোগ চমকপ্রদ। 'বন্দে মাতরম্' গানের ষষ্ঠ পঙক্তিতে দেবীকে বলা হয়েছে- 'শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীম্'। দেবীমাহাত্ম্যেও ব্রহ্মার স্তবে দেবীকে বলা হয়েছে 'রাত্রি' (১।৭৯)। [১১] দেবীর এই রূপের আদি উৎস ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের অন্তর্গত রাত্রিসূক্ত। সায়নাচার্যের ব্যাখ্যায়, রাত্রিদেবী জগৎ-কারণভূতা মহামায়া। [১২] বঙ্কিমের গানে এই রাত্রি 'শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত'। খেয়াল করে দেখবেন, 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে ভবানন্দ গান ধরেছেন 'জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে'। আসলে দেবীমাহাত্ম্যে শক্রাদি দেবতাদের স্তবে দেবীকে বলা হয়েছে পূর্ণচন্দ্রাননা — 'ঈষৎসহাসমমলং পরিপূর্ণচন্দ্রং বিম্বানুকারি বক্ত্রং' (৪।১২)। [১৩] দুর্গাসপ্তশতীর পঞ্চম অধ্যায়ে দেবতারা তাঁকে বলেছেন 'জ্যোৎস্নায়ৈ চেন্দুরূপিণ্যৈ' (৫।১০)— 'জ্যোৎস্নারূপা' ও 'চন্দ্ররূপা'। [১৪] দেবী 'ঈষৎসহাসম্' বলেই বঙ্কিমের গানের মধ্যে দেবীকে বলা হয়েছে – 'সুহাসিনীং' ও 'সুস্মিতাং'। একইসঙ্গে তিনি 'সুমধুরভাষিণীম্' ও 'সরলাং'। শ্রীশ্রীচণ্ডীতেও দেবী 'সৌম্যাসৌম্যতরাশেষ সৌম্যেভ্যস্ত্বতি সুন্দরী' (১।৮১)। [১৫] দেবীমাহাত্ম্যে চণ্ডীকে বলা হয়েছে – 'ত্বং শ্রী' (১।৭৯)। [১৬] তুমিই লক্ষ্মী। বঙ্কিমের গানে পাই, 'ত্বং হি ... কমলা-কমল-দলবিহারিণী'। এখানে 'তুমিই আমাদের লক্ষ্মী' অর্থাৎ কিনা তোমাকে (দেশমাতৃকাকে) ছাড়া আমরা আর কোনো লক্ষ্মীকে চিনি না [১৭] – এরূপ অর্থনিষ্পত্তি যুক্তিসংগত নয়। কারণ গানে এই দেবীর স্তুতি করতে গিয়ে এর পরেই পুনরায় একবার স্পষ্ট করে বলা হয়েছে – 'নমামি কমলাম্'। একইভাবে দেবীকে বলা হয়েছে – 'ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী' এবং 'বাণী বিদ্যাদায়িনী'। চণ্ডীতেও 'ত্বং শ্রী'-র ঠিক পরেই আছে 'ত্বমীশ্বরী' (১।৭৯) [১৮] – তুমিই ঈশ্বরী। দেবীর আরও একটি রূপ গানের মধ্যে আভাসিত – যিনি করাল নিনাদ করেন এবং যাঁর হাতে খরকরবাল বা তীক্ষ্ণধার খড়গ। দেবীমাহাত্ম্যে দেবী দুর্গা অর্থাৎ আদ্যাশক্তিরও তিনরূপ 'শ্রীমহাকালীমহালক্ষ্মীমহাসরস্বত্যো দেবতাঃ' [১৯] – সত্ত্বগুণের প্রভাবে তিনি মহাসরস্বতী, রজোগুণের মহিমায় তিনি মহালক্ষ্মী, তমোগুণে তিনিই মহাকালী।

বলা বাহুল্য, 'বন্দে মাতরম্' কখনোই ভবানন্দের স্বোদ্ভাবিত একক সঙ্গীত নয়। এ গান আনন্দমঠের সন্তানদের বৃন্দগীতি। ভবানন্দের 'মা' ও সন্তানদলের 'মা' অভিন্ন। 'আনন্দমঠ'-এর অভ্যন্তরে সত্যানন্দের সাহচর্যে মহেন্দ্র এই দেবীর বিভিন্ন রূপ দর্শন করেছেন। সেখানে 'মা যা ছিলেন' (জগদ্ধাত্রী), 'মা যা হইয়াছেন' (কালী) এবং 'মা যা হইবেন' (দুর্গা)-র সঙ্গে লক্ষ্মী-সরস্বতীও উপস্থিত। সেইসঙ্গে আছেন বিষ্ণুর অঙ্কশায়িতা এক দেবী। তিনি 'লক্ষ্মী সরস্বতীর অধিক সুন্দরী, লক্ষ্মী সরস্বতীর অধিক ঐশ্বর্যান্বিতা'। 'কে উনি?'— এই প্রশ্নের উত্তরে সত্যানন্দ মহেন্দ্রকে বলেছেন, 'মা' — 'আমরা যাঁর সন্তান'। [২০] আনন্দমঠের গর্ভমন্দিরে সন্তানদের 'মা' কেন মধুসূদন বিষ্ণুর বক্ষলগ্না, তার সদুত্তর খুঁজে পাওয়া যাবে শ্রীশ্রীচণ্ডীতে। দেবীমাহাত্ম্যের একাদশ অধ্যায়ে আদ্যাশক্তি

মহামায়াকে বলা হয়েছে ‘নারায়ণী’ এবং ‘ত্বং বৈষ্ণবীশক্তিরনন্তবীর্যা’ (১১।৫)। [২১] বৈষ্ণবীশক্তি মানে বিষ্ণুর জগৎ-পালিনী শক্তি। এইজন্য চণ্ডীর চতুর্থ অধ্যায়ে তিনিই ‘কৈটভারিহৃদয়ৈককৃতাধিবাসা’ (৪।১১)। [২২]

‘আনন্দমঠ’ উপন্যাসে এই দেবীর সম্পর্কে বলা হয়েছে ‘এক মোহিনী মূর্তি’। [২৩] শ্রীশ্রীচণ্ডীতেও আছে ‘তয়ৈতন্মোহ্যতে বিশ্বং’ (১২।৩৭) – তিনিই এই বিশ্বকে মায়ামুগ্ধ করেন। [২৪] একাদশ অধ্যায়ে দেবতারা বলেছেন, ‘এতৎ সমস্তং সম্মোহিতম্’ (১১।৫) – আপনি সমস্ত জগৎকে সম্মোহিত করেছেন। [২৫] সেইসঙ্গে বলা হয়েছে, ‘স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু’ (১১।৬)— জগতের সকল নারীই আপনার প্রতিমূর্তি। [২৬] বঙ্কিম দেখিয়েছেন, কল্যাণীর রূপমোহে আসক্ত ভবানন্দ ‘মা’-এর সম্মোহনে ব্রতচ্যুত হয়েছেন।

‘বন্দে মাতরম্’ গানের নবম পঙক্তিতে ‘মা’ কে বলা হয়েছে ‘সুখদাং’ ও ‘বরদাং’। ভৌম দেশমাতৃকা কখনও বরদান করতে পারেন না। ‘বরদা’ অভ্রান্ত ভাবেই জগন্মাতার বিশেষণ। দেবীমাহাত্ম্যে ইন্দ্রাদি দেবতাগণের স্তুতিতেও দেবী দুর্গাকে ‘বরদা ভব’ (১১।৩৫) বলা হয়েছে। [২৭] দেবী ‘সুখদাং’ কারণ শত্রু-নির্জিতকারিণী ও অভীষ্টফলপ্রদায়িনী। চণ্ডীতে আছে, ‘সুখায়ৈ সততং নমঃ’ (৫।১০)। [২৮] ‘সুখা’ মানে সুখদায়িনী’। অর্গলাস্তোত্রেও পাই, ‘ভক্তানাং সুখদে নমঃ’ (৪)। [২৯] আর-একজায়গায় গানের মধ্যে দেবীকে ‘নমামি তারিণীং’ বলে বন্দনা করা হয়েছে। ত্রিতাপদুঃখ থেকে ত্রাণ করেন বলে আদ্যাশক্তির অপর নাম ‘তারিণী’। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে মহামায়ার এই রূপের পরিচয় দিতে গিয়ে বলা হয়েছে, দেবী ভগবতী দুস্তর সংসার সমুদ্রের তরণী — ‘দুর্গাসি দুর্গভবসাগরনৌরসঙ্গা’ (৪।১১) [৩০] এবং ‘দুর্গায়ৈ দুর্গ-পারায়ৈ’ (৫।১২) [৩১]। গানে ‘তারিণী’ শব্দের আর-একটি তাৎপর্য এর ঠিক আগের পঙক্তিতেই বলে দেওয়া হয়েছে। ‘মা’ হলেন ‘রিপুদলবারিণীং’। অর্থাৎ বিশেষ করে, শত্রুদের দমন করেন বলে তিনি ‘তারিণী’। চণ্ডীতে দেবতারা বলেছেন, দেবীর স্বভাব হচ্ছে ‘দুর্বৃত্তবৃত্তশমনং’ (৪।২১) – দুরাচারীদের দুষ্প্রবৃত্তি দমন করা। [৩২] শ্রীশ্রীচণ্ডীতে স্বর্গের দেবগণ আদিভূতা পরা প্রকৃতিকে বলেছেন, ‘অতুলং’ (৪।৪) — অর্থাৎ যিনি অনুপম ও অদ্বিতীয়া। [৩৩] আবার দেবীর স্তবে তাঁকে বলা হয়েছে ‘অমলং’ (৪।১২)। [৩৪] কারণ তাঁর রূপ মালিন্যরহিত। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর মাতৃবন্দনায় উনত্রিশ সংখ্যক পঙক্তিতে এই দুটি শব্দই গ্রহণ করেছেন – ‘অমলাম্ অতুলাং’।

‘বন্দে মাতরম্’ গানের সতের সংখ্যক পঙক্তিতে বঙ্কিমচন্দ্র ‘মা’-কে বলেছেন ‘তুমি বিদ্যা’। চণ্ডীতে আছে, ‘বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ’ (১১।৬) হে দেবী, জগতের সমস্ত বিদ্যাই আপনি। [৩৫] বঙ্কিম তারপরে লিখেছেন, ‘তুমি ধর্ম’। এখানে ‘ধর্ম’ মানে সম্প্রদায়বিশেষের ধর্ম নয়। ‘ধর্ম’ বলতে বোঝানো হয়েছে যা আমাদের ধরে রাখে। চণ্ডীতে দেবতারা বলছেন, ‘ত্বয়ৈতদ্ ধার্যতে বিশ্বং’ (১।৭৫) – তুমিই এই বিশ্বকে ধারণ করে আছো। [৩৬] বঙ্কিমের গানে এর ঠিক পরের পঙক্তিতে আছে ‘তুমি হৃদি তুমি মর্ম’। ‘হৃদি’ আর ‘মর্ম’ একার্থবোধক হলেও এখানে দুটি শব্দের দ্যোতনা ভিন্ন। ‘হৃদি’ মানে চিত্ত আর মর্ম মানে মন। চিত্ত শব্দের তাৎপর্য হল চিৎশক্তি। দেবীমাহাত্ম্যের পঞ্চম অধ্যায়ে দেবীর স্তব করতে গিয়ে ইন্দ্রাদি দেবগণ বলেছেন: তিনিই চেতনা — ‘চিতিরূপেণ ব্যাপ্য’ (৫।৭৮) [৩৭], ‘চেতনেত্যভিধীয়তে’ (৫।১৯) [৩৮]। আবার মন অর্থাৎ ‘বুদ্ধি’, ‘স্মৃতি’, ‘ক্ষুধা’-‘তৃষ্ণা’-লজ্জা’ আদি অনুভূতি এবং ‘দয়া’-‘শ্রদ্ধা’-‘তুষ্টি’ প্রভৃতি ভাব রূপেও তিনিই ‘সর্বভূতেষু সংস্থিতা’। [৩৯] তিনি ইন্দ্রিয়বর্গেরও অধিষ্ঠাত্রী (৫।৭৭)। [৪০] দেবতারা আরও বলেছেন, ‘যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা’ (৫।৩২)। [৪১] অর্থাৎ তিনি সর্বজীবের ‘সারায়ৈ’ (৫।১২)। [৪২] এই শক্তি প্রাণশক্তি। বঙ্কিমের গানে আছে, ‘ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে’। কুড়ি সংখ্যক পঙক্তিতে বলা হচ্ছে, ‘বাহুতে তুমি মা শক্তি’। এখানে বিশেষ করে ‘বাহুতে’ বলার কারণ হল, এই শক্তি প্রাণশক্তির থেকে আলাদা। এ হচ্ছে কায়িক শক্তি। দেবীমাহাত্ম্যে দেবতারা বলেছেন, এই জগতের সকলের মধ্যে যেখানে যা কিছু শক্তি আছে, সব তুমি। ‘তস্য সর্বস্য যা শক্তিঃ’ (১।৮৩)। [৪৩] সব শেষে

আছে, 'হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি'। এখানে 'ভক্তি' বলতে নিঃসন্দেহে বৈধী ভক্তিই বোঝানো হয়েছে। খেয়াল করবেন, 'আনন্দমঠ'-এ সত্যানন্দ মহেন্দ্রকে বলেছেন, চৈতন্যদেবের বৈষ্ণবধর্ম আর সন্তানদের বৈষ্ণবধর্ম আলাদা। [৪৪] চণ্ডীর প্রথম অধ্যায়ে ব্রহ্মার স্তব শুরু হচ্ছে এই বলে: 'ত্বং স্বাহা ত্বং স্বধা ত্বং হি বষট্‌কারঃ স্বরাত্মিকা' (১।৭৩)। [৪৫] অর্থাৎ ঔপচারিক বৈধী উপাসনায় অর্চন-বন্দন সমস্তই ভগবতী স্বয়ং।

বঙ্কিমচন্দ্রের গানে 'মা'-এর রূপকল্পনার আরও একটি দিক বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। দেবী এখানে 'সপ্তকোটিকণ্ঠ' -এ 'কলকলনিনাদকরালে'। আর 'দ্বিসপ্তকোটি' ভুজে তিনি ধারণ করে আছেন তাঁর 'খর-করবাল'। 'বন্দে মাতরম্'-কে যাঁরা 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে বিচার করতে চান, তাঁদের যুক্তি হল, ১৮৭২-৭৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র যখন গানটি প্রথম রচনা করেন, সেইসময়ের জনগণনার নিরিখে 'সপ্তকোটিকণ্ঠ' ও 'দ্বিসপ্তকোটিভুজ'-এর হিসাব সম্পূর্ণ নির্ভুল। কারণ আমরা আগেই দেখেছি, অবিভক্ত বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিতে তখন মোট লোকসংখ্যা ছিল প্রায় সাত কোটি। উল্টোদিকে, 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের ঘটনাকাল হল ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দ। সেসময়ে বাংলার জনসংখ্যা সাত কোটিতে পৌঁছায়নি। সুতরাং উপন্যাসের আখ্যানভাগে গানটির সংযোজনকে তাঁরা একটি গুরুতর কালানৌচিত্য দোষ হিসেবে গণ্য করেন। তাঁদের মতে, এই প্রেক্ষাপটটি বিশ্লেষণ করলে এটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, 'বন্দে মাতরম্' কোনোভাবেই 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে উঠতে পারেনি। ফলে এই গান স্বতন্ত্র ভাবে অর্থাৎ উপন্যাসের আখ্যান-নিরপেক্ষ ভাবেই আস্বাদ্য। ১৮৭১ সালে 'সপ্তকোটি' বাঙালির মধ্যে হিন্দু-মুসলমান উভয় পক্ষই মিলেমিশে ছিল। তাই বাঙালির এই ঐক্যকে শ্রদ্ধা জানিয়ে 'বন্দে মাতরম্'-কে বাঙালি মুসলমানদেরও সাদরে গ্রহণ করা উচিত।

এমতাবস্থায় একটি প্রশ্ন ওঠা অত্যন্ত স্বাভাবিক — ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময়কার বাংলাদেশে 'সপ্তকোটি' জনসংখ্যা যে অসম্ভব, বঙ্কিমচন্দ্র কি তা বুঝতে পারেননি? নাকি তিনি জেনেশুনেই এই অসঙ্গতিকে উপেক্ষা করেছিলেন? উপন্যাসের মধ্যেই এই প্রশ্নের সোজাসাপটা উত্তর আছে।

'আনন্দমঠ'-এর প্রথম খণ্ডের দশম পরিচ্ছেদে ভবানন্দ মহেন্দ্রকে বলেছেন, সকল দেশে রাজার সঙ্গে প্রজার রক্ষণাবেক্ষণের সম্বন্ধ। অরাজক বাংলাদেশে প্রজারা বড়ই হতভাগ্য। 'কোন্ দেশের এমন দুর্দশা, কোন্ দেশে মানুষ খেতে না পেয়ে ঘাস খায়? কাঁটা খায়? উইমাটি খায়? বনের লতা খায়? কোন্ দেশে মানুষ শিয়াল কুকুর খায়, মড়া খায়? কোন্ দেশের মানুষের সিন্দুকে টাকা রাখিয়া সোয়াস্তি নাই, সিংহাসনে শালগ্রাম রাখিয়া সোয়াস্তি নাই, ঘরে ঝি বউ রাখিয়া সোয়াস্তি নাই, ঝি বউয়ের পেটে ছেলে রেখে সোয়াস্তি নাই? পেট চিরে ছেলে বার করে।' তাই 'এ নেশাখোর দেড়েদের না তাড়াইলে আর কি হিন্দুর হিন্দুয়ানি থাকে?' [৪৬] এরপরে দুজনের মধ্যে কথোপকথন খেয়াল করুন:

মহে। তাড়াবে কেমন করে?

ভবা। মেরে।

মহে। তুমি একা তাড়াবে? এক চড়ে নাকি?

দস্যু গায়িল :—

"সপ্তকোটীকণ্ঠ-কলকল-নিনাদকরালে!
দ্বিসপ্তকোটীভুজৈর্ধৃতখরকরবালে
অবলা কেন মা এত বলে।"

মহে। কিন্তু দেখিতেছি তুমি একা।

ভবা৷ কেন, এখনি ত দুশ লোক দেখিয়াছ৷

মহে৷ তাহারা কি সকলে সন্তান?

ভবা৷ সকলেই সন্তান৷

মহে৷ আর কত আছে?

ভবা৷ এমন হাজার হাজার, ক্রমে আরও হবে৷ [৪৭]

এখানে পরিষ্কার ভাবেই বোঝা যাচ্ছে, বঙ্কিমচন্দ্র অত্যন্ত সুকৌশলে কালানৌচিত্য খণ্ডন করেছেন৷ ভবানন্দের স্থির বিশ্বাস, গানের ওই ‘সপ্তকোটি’ এখনও হয়নি বটে, কিন্তু ক্রমশ ‘হাজার হাজার’ থেকে বাড়তে বাড়তে একদিন সংখ্যাটা সাত কোটিতে পৌঁছাবে৷ বলা বাহুল্য, ভবানন্দের তথা সন্তানদলের ওই স্বপ্নাদ্য সাত কোটির রেজিমেন্টে মুসলমানদের কোনো জায়গা নেই৷ বিশেষ করে ‘সিংহাসনে শালগ্রাম রাখিয়া সোয়াস্তি নাই’ কথাটার মধ্য দিয়ে উপন্যাস-কথক স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিয়েছেন, নির্যাতিতরা সকলেই হিন্দু আর দুর্বৃত্তরা সকলেই মুসলমান৷

সাত কোটি সমবেত কণ্ঠে দেবীর ভয়াল হুহুংকার আর চোদ্দ কোটি হাতে শাণিত খড়গ ধারণের এই যে কল্পনা, তাও দেবীমাহাত্ম্যের দ্বারাই উদ্বুদ্ধ৷ চণ্ডীতেও দেবতাদের পুঞ্জীভূত তেজোরাশি থেকে জগন্মাতা তাঁর দিব্যরূপ পরিগ্রহ করেছেন — ‘সমস্তদেবানাং তেজোরাশিসমুদ্ভবাম্’ (২৷১৯) [৪৮] ‘নিঃশেষদেবগণশক্তিসমূহমূর্ত্যা’ (৪৷৩) [৪৯]৷

এতক্ষণ ধরে আমরা যে আলোচনা করলাম, তার থেকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, ‘বন্দে মাতরম্’ আগাগোড়াই জগজ্জননী পরমা প্রকৃতির বন্দনা৷ আনন্দমঠের অভ্যন্তরেও ‘মন্দিরে মন্দিরে’ তাঁরই প্রতিমা বিরাজমান৷ এই গানে বিশেষ ভাবে দেশমাতৃকার কথা কোথাও নেই৷ তাহলে ভবানন্দ যে ‘জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী’ বলে মহেন্দ্রর সামনে বহ্বাস্ফোট করেছিলেন, তার নিহিতার্থ আসলে কী? কথাটা এবারে একটু ভালো করে তলিয়ে দেখা দরকার৷

‘জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী’ উক্তিটি রামায়ণে আছে৷ স্বর্ণময়ী লঙ্কার থেকে অযোধ্যানগরীর শ্রেষ্ঠত্ব বোঝাতে গিয়ে রামচন্দ্র এই কথাটি বলেছিলেন লক্ষ্মণকে৷ এর অর্থ: জননী এবং (চ) জন্মভূমি স্বর্গের চেয়েও (স্বর্গাৎ অপি) গরিমাময়ী৷ খেয়াল করে দেখবেন, এখানে ‘এবং’ সংযোজক অব্যয়টির দ্বারা ‘জন্মভূমি’-র থেকে ‘জননী’-কে পৃথক করা হয়েছে৷ এখানে ‘জননী’ শব্দটি ‘জন্মভূমি’-র বিশেষণ বা সমার্থক নয়, এমনকি তাদের অভেদ-সম্বন্ধও কল্পনা করা হয়নি৷ ভবানন্দ কিন্তু বলেছেন, ‘আমরা অন্য মা মানি না … আমাদের মা নাই’ ‘আমরা বলি — জন্মভূমিই জননী৷’ [৫০] ভবানন্দের এই শেষ কথাটুকু একবার উল্টো করে দেখলেই সংস্কৃত ওই ‘চ’ অব্যয়টার অর্থ পরিষ্কার বুঝতে পারা যাবে৷ ভবানন্দ আসলে বলতে চেয়েছেন, সন্তানরা যাঁকে ‘জননী’ বলে বন্দনা করে, যিনি নিখিলবিশ্বের অধিষ্ঠাত্রী, যিনি জগৎস্বরূপা, স্বদেশের মধ্যেও তাঁরই অধিষ্ঠান৷ তিনি বঙ্গদেশের মধ্যে সীমায়িত নন বটে৷ তবে বঙ্গদেশও তিনিই৷

এই ‘জগন্মূর্তি’ ‘জগদ্ধাত্রী’-র কাছে আনন্দমঠের অধিনায়ক সত্যানন্দ মনেপ্রাণে প্রার্থনা করেছেন, ‘মুসলমানেরা ভগবানের বিদ্বেষী বলিয়া তাহাদের সবংশে নিপাত করিতে চাই’। [৫১] ‘ধর্মতত্ত্ব’ গ্রন্থে ‘অনুশীলন ধর্ম’ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র প্রসঙ্গক্রমে লিখেছিলেন: মানুষের প্রীতিবৃত্তি চতুর্বিধ — আত্মপ্রীতি, স্বজনপ্রীতি, স্বদেশপ্রীতি ও জাগতিক প্রীতি; এবং এই চারপ্রকার প্রীতিবৃত্তির সম্যক অনুশীলন ও সামঞ্জস্য-বিধানেই মনুষ্যস্বভাবের পরিপূর্ণতা৷ [৫২] লক্ষ করে দেখবেন, ‘আনন্দমঠ’ উপন্যাসে সম্প্রদায়গত স্বজনপ্রীতির একবল্গা অনুশীলনের ফলে সন্তানদের মধ্যে জাগতিক প্রীতি তো দূরের কথা, এমনকি স্বদেশপ্রীতিও সম্যক স্ফূর্তি লাভ করতে পারেনি৷

'আনন্দমঠ'-এর অন্তিম পরিচ্ছেদে সত্যানন্দকে আশ্বস্ত করে মহাপুরুষ বলেছিলেন, 'ব্রত সফল হইয়াছে'। কেননা মুসলমান-রাজ্য ধ্বংস করে ইংরেজ-রাজ্য স্থাপিত করাই সন্তানদলের ব্রত। মহাপুরুষের কথায়, 'শত্রু আর নাই। ইংরেজ মিত্ররাজা।' ইংরেজ-রাজ্যে প্রজারা নিষ্কন্টকে ধর্মাচরণ করবে। ইউরোপীয় শিক্ষায় এদেশের মানুষ বহিস্তত্ত্বে সুশিক্ষিত হয়ে অন্তস্তত্ত্বের উপলব্ধিতে সক্ষম হবে। তখন সনাতনধর্ম পুনরুদ্দীপ্ত হবে। কাজেই হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠার আর কোনো বাধা থাকবে না। [৫৩]

'বঙ্গদর্শন' পত্রিকাপাঠে সত্যানন্দকে তীব্র ভর্ৎসনা করে মহাপুরুষ বলেছিলেন, 'ব্রত সফল হইবে না — কেন তুমি নিরর্থক নরশোণিতে পৃথিবী প্লাবিতা করিতে চাও?' [৫৪] পঞ্চম সংস্করণে মহাপুরুষই প্রশংসা করে বলেছেন, 'ব্রত সফল হইয়াছে — মার মঙ্গল সাধন করিয়াছ'। [৫৫] বলা বাহুল্য, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে মুসলমান-রাজ্য ধ্বংস করে 'মার মঙ্গল সাধন'-এর পরমার্থটি নরশোণিতেই সম্পন্ন হয়েছে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় সত্যানন্দের ক্ষুব্ধ পরিপ্রশ্ন থেকে আমরা এও জানতে পারি, সেই 'নৃশংস যুদ্ধকার্যে' মহাপুরুষই সন্তানদলকে নিযুক্ত করেছিলেন। [৫৬]

বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মশতবর্ষে 'শনিবারের চিঠি' পত্রিকায় প্রকাশিত "বঙ্কিম ও মুসলমান সম্প্রদায়" প্রবন্ধে সুনীলকুমার বসু লিখেছিলেন: 'উপন্যাসের মধ্যে লেখকের মনোভাব সব সময় খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। উপন্যাসের চরিত্রগুলি সাধারণত কাল্পনিক হয়, এবং তাহাদের কথাবার্তাও হয় নাটকীয়ভাবে রচিত। তাহার মধ্যে কোনটা যে লেখকের যথার্থ অভিমত এবং কোনটা নয়, তাহা স্থির করা প্রায় দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে।' [৫৭]

মজার ব্যাপার হল, বাঙালির জাতীয়তাবাদী চেতনাকে উসকে দিতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র কেন যে মুসলিম শাসনের এক অন্ধকার অধ্যায়কেই উপজীব্য করলেন, সাড়ে পাঁচশ বছরের মুসলমান শাসনকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে কেনই বা তিনি বেছে নিলেন পলাশী-পরবর্তী সময়কালকে, আর কোম্পানির সীমাহীন শোষণে জর্জরিত ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পটভূমিতে কেনই বা তিনি 'আনন্দমঠ'-কে বীরভূমে স্থাপনা করলেন — সুনীলকুমার কিংবা সমমনস্ক আলোচকদের বিশ্লেষণে এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলো বরাবরই উপেক্ষিত রয়ে গেছে।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে প্রকাশিত 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের শতবার্ষিকী সংস্করণের ভূমিকায় এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা-র ষষ্ঠ খণ্ড থেকে গ্রন্থ-সম্পাদক যে 'কৌতূহলোদ্দীপক' অংশটি উদ্ধৃত করেছেন, সেখানে বলা হয়েছে: '... though the Ananda Math is in form of an apology for the loyal acceptance of British rule, it is none the less inspired by the ideal of the restoration, sooner or later, of a Hindu kingdom in India.' [৫৮] বঙ্কিমচন্দ্রের এই অলৌকিক 'Hindu kingdom'-এর রাজনৈতিক স্বপ্নের মর্মমূলে যে সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি অনবরত ক্রিয়াশীল ছিল, তার উদগ্র তাড়না সবথেকে ক্ষুণ্ন করেছে উপন্যাসের অন্তর্গত ঐতিহাসিক সত্যকে।

'আনন্দমঠ'-এর প্রথম খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদ শুরু হচ্ছে '১১৭৬ সালে গ্রীষ্মকালে'। [৫৯] আর চতুর্থ খণ্ডের অষ্টম পরিচ্ছেদে মহাপুরুষ সত্যানন্দকে বলছেন, 'ইংরেজ মিত্ররাজা'। [৬০] 'আনন্দমঠ' লিখতে গিয়ে বঙ্কিম যে-বই থেকে ইতিহাসের ভানটুকু জোগাড় করেছিলেন, সেই 'The Annals of Rural Bengal'-এ W. W. Hunter ১১৭৬ বঙ্গাব্দের ওই অভিশপ্ত গ্রীষ্ম সম্পর্কে বলতে গিয়ে জানিয়েছেন: 'All through the stifling summer of 1770 the people went on dying. The husbandmen sold their cattle; they sold their implements of agriculture; they devoured their seed-grain; they sold their sons and daughters, till at length no buyer of children could be found; they eat the leaves of trees and the grass of the field; and in June 1770 the Resident at the Durbar affirmed that the living were feeding on the dead.' [৬১]

'আনন্দমঠ'-এর প্রথম পরিচ্ছেদের তৃতীয় অনুচ্ছেদ পুরোটাই Hunter-এর সরকারি প্রতিবেদনের ছায়াবলম্বনে রচিত। তার ঠিক আগের অনুচ্ছেদেই আছে — 'মহম্মদ রেজা খাঁ রাজস্ব আদায়ের কর্তা'। [৬২] বঙ্কিম বেশ ভালো করেই জানতেন, বাংলা-বিহার-ওড়িশার এই ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের অন্তরালে ছিল রবার্ট ক্লাইভের প্রবর্তিত দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা। কোম্পানিই এর প্রধান কারিগর। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শোষণের সেই অমানবিক নিষ্ঠুরতাকে গা-বাঁচিয়ে ধামাচাপা দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজকে 'মিত্ররাজা' বানিয়েছেন।

'আনন্দমঠ'-এর পত্রিকাপাঠে মহম্মদ রেজা খাঁর নামোল্লেখের পরেই ছিল– 'একে বাঙ্গালি তাহাতে মুসলমান'। [৬৩] আর অনুচ্ছেদটা শেষ হচ্ছে – 'বাঙ্গালায় বড় কান্নার কোলাহল পড়িয়া গেল। ' [৬৪] 'মুসলমান' নায়েব দেওয়ান, সরফরাজ হওয়ার লোভে শতকরা দশ টাকা রাজস্ব বাড়িয়ে দেওয়ার ফলেই বাংলার এক কোটি মানুষ না খেতে পেয়ে মরে গেল, এই ছেলেভুলানো অপযুক্তিটি বঙ্কিম ইচ্ছাকৃত ভাবে তৈরি করেছেন। আর এ কাজে তাঁকে সাহায্য করেছেন সাম্রাজ্যবাদী ইতিহাসপ্রণেতা।

এখানে বলে রাখা ভালো, Hunter তাঁর বইতে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের নানাবিধ কারণ বর্ণনা করেছেন। প্রকৃতির খামখেয়ালিপনা, কোম্পানির রাজকর্মচারীদের অদূরদর্শিতা, শাসন পরিষদের প্রশাসনিক টালবাহানা, রাজস্ব আদায়ে কোম্পানির কড়া মনোভাব তার মধ্যে প্রধান। [৬৫] সেইসঙ্গেই কোম্পানির অপযশ লাঘব করতে গিয়ে Hunter রেজা খাঁকে টেনে এনেছেন। এই প্রসঙ্গে আইসিএস ঐতিহাসিকের কূটনৈতিক চতুরালি লক্ষ করার মতো। রেজা খাঁর কথা বলতে গিয়ে প্রায় সব জায়গাতেই নাম না করে Hunter লিখেছেন — 'A Mussulman Minister of State'। [৬৬] ব্যক্তিনামকে একেবারে চেপে দিয়ে ধর্ম দিয়ে মানুষ চেনানোর এই ধূর্ত কৌশল বঙ্কিমের নজর এড়িয়ে যাওয়ার কথা নয়। বিভেদকামী ব্রিটিশ রাষ্ট্রশক্তির চমকপ্রদ চালটিকেই তিনি নিজের উপন্যাসে সচেতন ভাবে কাজে লাগিয়েছেন। "বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা" প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র আক্ষেপ করে লিখেছিলেন: 'হায়! বাঙ্গালীর ঐতিহাসিক স্মৃতি কই?' [৬৭] বাঙালির ঐতিহাসিক স্মৃতি দুর্বল বলেই যে সে স্মৃতিকে ঘুলিয়ে দেওয়াও আরও সহজ, সেকথা বঙ্কিম বেশ বুঝতে পেরেছিলেন।

ভূগোল নিয়েও কি বঙ্কিম কম নয়ছয় করেছেন? বঙ্গদর্শন পত্রিকাপাঠে 'আনন্দমঠ'-এর ঘটনাস্থল বীরভূম। উত্তরবঙ্গের সন্ন্যাসীবিদ্রোহকে কেন বিশেষ ভাবে বীরভূমেই নিয়ে যেতে হল? পত্রিকাপাঠে কারণটা বঙ্কিমই ব্যক্ত করেছেন: 'বীরভূম প্রদেশ বীরভূম রাজার অধীনে। ... আধুনিক রাজবংশ মুসলমান। ... বীরভূম প্রদেশে এ পর্য্যন্তও কালেক্টর নিযুক্ত হয় নাই। রাজাই ইংরেজের কর আদায় করিয়া কলিকাতায় পাঠাইয়া দিতেন।' [৬৮] সোজা কথায়, বীরভূমে শাসন আর শোষণ দুটোর জন্যই দায়ী মুসলমান রাজা। বঙ্কিমের আখ্যানে মন্বন্তরের ওই প্রাণঘাতী বীভৎসার গোড়ায় আছেন মুসলমান রেজা খাঁ, আর আগায় আছেন রাজনগরের মুসলমান রাজা আলিনকি খাঁ। আর ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি? ও দিকে তাকিয়ে দ্যাখো ধোয়া তুলসীপাতা।

বঙ্কিমের এই উপন্যাসে আরেকটি গুরুতর বিভ্রাটের কথা অনেকেই উল্লেখ করেছেন। 'আনন্দমঠ'-এর প্রথম খণ্ডের সপ্তম পরিচ্ছেদে ইংরেজকে দায়মুক্ত করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন: '১১৭৬ সালে বীরভূম প্রভৃতি প্রদেশ ইংরেজের শাসনাধীন হয় নাই। ইংরেজ তখন বাঙ্গালার দেওয়ান। তাঁহারা খাজনার টাকা আদায় করিয়া লন, কিন্তু তখনও বাঙ্গালীর প্রাণ সম্পত্তি প্রভৃতি রক্ষণাবেক্ষণের কোন ভার লয়েন নাই। তখন টাকা লইবার ভার ইংরেজের, আর প্রাণ সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের ভার পাপিষ্ঠ নরাধম বিশ্বাসহন্তা মনুষ্যকুলকলঙ্ক মীরজাফরের উপর। মীরজাফর আত্মরক্ষায় অক্ষম, বাঙ্গালা রক্ষা করিবে কি প্রকারে? মীরজাফর গুলি খায় ও ঘুমায়। ইংরেজ টাকা আদায় করে ও ডেস্‌পাচ্ লেখে। বাঙ্গালী কাঁদে আর উৎসন্ন যায়।' [৬৯] এখানে খেয়াল করিয়ে দিই, ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পাঁচবছর আগে মীরজাফরের মৃত্যু হয়েছে। সুতরাং গুলি খেয়ে ঘুমানোর প্রশ্নই ওঠে না। তবু সেই 'পাপিষ্ঠ নরাধম বিশ্বাসহন্তা মনুষ্যকুলকলঙ্ক'-কে জোর করে জিন্দা করে তোলার কারণ একটাই। বঙ্কিমের বানিয়ে-তোলা ইতিহাসে বীরভূম থেকে বাংলা সর্বত্রই 'বাঙ্গালী'-র শত্রু মুসলমান। সেখানে মীরকাশিম বা বক্সার যুদ্ধের নামগন্ধও নেই। মুসলমানরা কখনও দেশের জন্য লড়েনি।

‘আনন্দমঠ’-এ বঙ্কিমের এই বিবৃতি যে তথ্যের অপ্রতুলতার কারণে অনিচ্ছাকৃত কোনো প্রমাদ নয়, বরং আগাগোড়াই অসৎ উদ্দেশ্যে উদ্ভাবিত সুচতুর এক প্রতারণা, খুব সহজেই তা ধরতে পারা যায় সমকালীন আরেকটি বয়ান পাশাপাশি মিলিয়ে পড়লো ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত ‘বাঙ্গালার ইতিহাস’ গ্রন্থের ‘সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত’ সংস্করণে বঙ্কিমচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সুহৃদ্ রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন: ‘মীরকাশিমের সহিত যুদ্ধ সংবাদ পাইয়া কোম্পানির ডাইরক্টরেরা এতদ্দেশে ক্লাইবকে পুনঃপ্রেরণ করেন। ১৭৬৫ অব্দের মে মাসে তিনি কলিকাতায় উপস্থিত হন। তাঁহার আগমনের পূর্ব্বে মীরজাফরের মৃত্যু হয়’। [৭০] ওই বইতেই ‘দেশের অবস্থা’ সম্পর্কে বলতে গিয়ে রাজকৃষ্ণ লিখেছিলেন: ‘পলাশীর যুদ্ধের পরে ইংরেজরাই বাস্তবিক এ দেশের অধিপতি হইলেন। অনন্তর যে কেহ নবাব হইয়াছেন, সে কেবল তাঁহাদিগেরই অনুগ্রহে।’ [৭১] ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে ‘বঙ্গদর্শন’ পত্রিকায় বইটির ‘বালপাঠ্য’ প্রথম মুদ্রণের সমালোচনা লিখতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র ভূয়সী প্রশংসা করে লিখেছিলেন: ‘রাজকৃষ্ণবাবু মনে করিলে বাঙ্গালার সম্পূর্ণ ইতিহাস লিখিতে পারিতেন; তাহা না লিখিয়া তিনি বালক শিক্ষার্থ একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক লিখিয়াছেন। যে দাতা মনে করিলে অর্দ্ধেক রাজ্য এক রাজকন্যা দান করিতে পারে, সে মুষ্টিভিক্ষা দিয়া ভিক্ষুককে বিদায় করিয়াছে। মুষ্টিভিক্ষা হউক, কিন্তু সুবর্ণের মুষ্টি।’ [৭২]

বঙ্কিমের উৎকট অবদমিত স্বজনপ্রীতি ‘আনন্দমঠ’-এর আখ্যান-পরিকল্পনাকে কীভাবে সরাসরি প্রভাবিত করেছে, তার আর-একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে আলোচনা শেষ করব। ইতিহাসের বিদ্রোহীদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে কোম্পানির দলিল-দস্তাবেজ ঘেঁটে W. W. Hunter লিখেছেন: ‘known under the name of Sanyasis or Faquirs’। [৭৩] ‘আনন্দমঠ’-এর সন্তানরা সকলেই ‘Sanyasis’। ‘Faquirs’-কে নিঃশব্দে ছেঁটে ফেলে গণ-অভ্যুত্থানের অসাম্প্রদায়িক বহুমাত্রিকতাকে ঘষেমেজে এক করে দেওয়ার উদ্দেশ্য একটাই। বঙ্কিমের লড়াই মুসলমানের বিরুদ্ধে হিন্দুর একটেরে লড়াই।

উপসংহার – ‘বন্দে মাতরম্’ সঙ্গীতের বহিরঙ্গ বাণীরূপ ও অন্তরঙ্গ ভাবনির্যাস পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে আমরা দেখতে পাই, এই রচনার অন্তরালে দেবীমাহাত্ম্যের নিগূঢ় প্রেরণা নিবিড় ভাবে ক্রিয়াশীল। বঙ্কিমচন্দ্র এই গানে ‘মা’-এর যে দিব্যরূপ কল্পনা করেছিলেন, তার সঙ্গে ‘আনন্দমঠ’ উপন্যাসের অন্তর্লীন মাতৃভাবনা নিবিড় যোগসূত্রে জড়িত। আমরা এও লক্ষ করেছি, দেশজননীর বন্দনাগীতি রূপে গানটি সুপরিচিত হলেও এর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে পরমা প্রকৃতির ঐশী মহিমা। এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না, ইসলামি ধর্মবিশ্বাসের ‘তৌহিদ’-এর আদর্শ ‘বন্দে মাতরম্’-এর পৌরাণিক আদিকল্পের পরিপন্থী। এ কথাও মনে রাখতে হবে, সন্তানদলের স্বজনপ্রীতি-সর্বস্ব অসম্পূর্ণ স্বাদেশিকতা-ধর্ম আর বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবর্তিত সামঞ্জস্য-নির্ভর অনুশীলন ধর্মের মধ্যে কয়েকটি বিষয়ে গুরুতর প্রভেদ থাকলেও উপন্যাসে বঙ্কিম স্বদেশব্রতের যে সংকীর্ণ আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছেন, তাতে মুসলমান সমাজের ভাবাবেগে আঘাত লাগা অযৌক্তিক নয়। লক্ষণীয় যে, ১৮৯২ সালে প্রকাশিত তাঁর জীবদ্দশার শেষ সংস্করণেও লেখক এই আখ্যানের সংবেদনশীল অংশগুলোতে কোনো পরিবর্তন বা পরিমার্জন করেননি। অতএব, ভারতের মুক্তিসংগ্রামের গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্যের সঙ্গে নিবিড় সংযোগ থাকা সত্ত্বেও, সাংবিধানিক মৌলিক অধিকার ও অন্তর্ভুক্তিমূলক আদর্শের বিচারে জাতীয় সংগীত হিসাবে এই গানের প্রাসঙ্গিকতা ও সর্বজনীনতা পুনর্মূল্যায়ন করা প্রয়োজন।

সূত্রনির্দেশ -

১. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, আনন্দমঠ, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, বঙ্কিম-শতবার্ষিক সংস্করণ, আষাঢ় ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ, কলকাতা, পৃ. ২৩-২৪

২. সুরেশচন্দ্র সমাজপতি (সম্পাদক), বঙ্কিম-প্রসঙ্গ, নবপত্র প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ ১৯২২, দ্বিতীয় সংস্করণ, মার্চ ১৯৮২, কলকাতা, পৃ. ৩২

৩. জগদীশ ভট্টাচার্য, বন্দে মাতরম্, কবি ও কবিতা প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ, জুন ১৯৭৮, কলকাতা, পৃ. ১৯-২১

৪. দেবী-মাহাত্ম্য, শ্রীমৎ স্বামী জগদীশ্বরানন্দ (সম্পাদনা), শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মচক্র, প্রথম প্রকাশ, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ, বেলুড়, পৃ. ১৮৯

৫. তত্রৈব, পৃ. ১৮১

৬. তত্রৈব, পৃ. ১৮২

৭. তত্রৈব, পৃ. ৯৪

৮. তত্রৈব, পৃ. ১৮৮

৯. তত্রৈব

১০. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, আনন্দমঠ, পৃ. ২২

১১. দেবী-মাহাত্ম্য, পৃ. ১৮৯

১২. তত্রৈব, পৃ. ৬৯

১৩. তত্রৈব, পৃ. ৩১১

১৪. তত্রৈব, পৃ. ৩৬০

১৫. তত্রৈব, পৃ. ১৮৯

১৬. তত্রৈব

১৭. জগদীশ ভট্টাচার্য, বন্দে মাতরম্, পৃ. ১৩৩

১৮. দেবী-মাহাত্ম্য, পৃ. ১৮৯

১৯. শ্রীশ্রীচণ্ডী, গীতা প্রেস, উনবিংশতিতম পুনর্মুদ্রণ, ২০১৬, গোরখপুর, পৃ ৬৪

২০. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, আনন্দমঠ, পৃ. ২৮

২১. দেবী-মাহাত্ম্য, পৃ. ৫৩১

২২. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, আনন্দমঠ, পৃ. ২৮

২৩. দেবী-মাহাত্ম্য, পৃ. ৩১১

২৪. তত্রৈব, পৃ. ৬০৬

২৫. তত্রৈব, পৃ. ৫৩১

২৬. তত্রৈব

২৭. তত্রৈব, পৃ. ৫৬২

২৮. তত্রৈব, পৃ. ৩৬০

২৯. শ্রীশ্রীচণ্ডী, পৃ. ৩৬

৩০. দেবী-মাহাত্ম্য, পৃ. ৩১১

৩১. তত্রৈব, পৃ. ৩৬০

৩২. তত্রৈব, পৃ. ৩৩৭

৩৩. তত্রৈব, পৃ. ২৯২

৩৪. তত্রৈব, পৃ. ৩১১

৩৫. তত্রৈব, পৃ. ৫৩১

৩৬. তত্রৈব, পৃ. ১৮৮

৩৭. তত্রৈব, পৃ. ৩৭৫

৩৮. তত্রৈব, পৃ. ৩৬৬

৩৯. তত্রৈব, পৃ. ৩৬৬-৩৭৪

৪০. তত্রৈব, পৃ. ৩৭৫

৪১. তত্রৈব, পৃ. ৩৭০

৪২. তত্রৈব, পৃ. ৩৬০

৪৩. তত্রৈব, পৃ. ২০২

৪৪. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, আনন্দমঠ, পৃ. ৬৬

৪৫. দেবী-মাহাত্ম্য, পৃ. ১৮৮

৪৬. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, আনন্দমঠ, পৃ. ২৫

৪৭. তত্রৈব, পৃ. ২৬

৪৮. দেবী-মাহাত্ম্য, পৃ. ২৩০

৪৯. তত্রৈব, পৃ. ২৯২

৫০. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, আনন্দমঠ, পৃ. ২২

৫১. তত্রৈব, পৃ. ৬৭

৫২. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিম রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ, ১৩৬১ বঙ্গাব্দ, কলকাতা, পৃ. ৬৪৭-৬৬১

৫৩. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, আনন্দমঠ, পৃ. ১৩০-১৩২

৫৪. তত্রৈব, পৃ. ১৫৯

৫৫. তত্রৈব, পৃ. ১৩২

৫৬. তত্রৈব, পৃ. ১৩১

৫৭. সজনীকান্ত দাস (সম্পাদক), শনিবারের চিঠি, বঙ্কিম সংখ্যা, নাথ পাবলিশিং, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ১৯৯৯, পৃ. ৯৭

৫৮. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, আনন্দমঠ, ভূমিকা, পৃ. viii

৫৯. তত্রৈব, পৃ. ৬

৬০. তত্রৈব, পৃ. ১৩২

৬১. W. W. Hunter, The Annals of Rural Bengal, Smith, Elder, And Co., 1868, London, p. 26

৬২. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, আনন্দমঠ, পৃ. ৭

৬৩. সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদক), বঙ্গদর্শন, সপ্তম বর্ষ ৮৪ সংখ্যা, চৈত্র ১২৮৭, কলকাতা, পৃ. ৫৪০

৬৪. তত্রৈব, পৃ. ৭

৬৫. W. W. Hunter, The Annals of Rural Bengal, pp. 20-21, 23

৬৬. Ibid, pp. 23-24

৬৭. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিম রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৩৩৬

৬৮. সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদক), বঙ্গদর্শন, সপ্তম বর্ষ ৮৪ সংখ্যা, চৈত্র ১২৮৭, কলকাতা, পৃ. ৫৪৯-৫৫০

৬৯. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, আনন্দমঠ, পৃ. ১৭

৭০. রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, বাঙ্গালার ইতিহাস, স্যানসক্রিট প্রেস ডিপোজিটরি, চতুর্দশ সংস্করণ, ১৮৭৯, কলকাতা, পৃ. ৮২

৭১. তত্রৈব, পৃ. ৬৯

৭২. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিম রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৩৩১

৭৩. W. W. Hunter, The Annals of Rural Bengal, p. 70